<< বিমান : আদি – অন্ত – দিগন্ত >>

"যদি আর বাশী না বাজে' রচনাটিতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন " আমার কাব্য, আমার গান, আমার জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য হতে জন্ম নিয়েছে"। এই লেখাটি বিদ্রোহী কবির উদ্ধৃত্ত দিয়ে শুরু করছি কারণ লেখালেখি করার জন্য যে ধরনের প্রজ্ঞা বা জ্ঞান থাকা দরকার তা আমার নেই কিন্তু তারপরও যে সাদা খাতায় আকি বুকি কাটি সে শুধু আমার জীবনের অভিজ্ঞতা যা আমি সবার সাথে ভাগ করি। মাঝে মাঝেই যখন লিখতে চেষ্টা করি কবির এই লাইন দুটো খুব মনে পড়ে, অবশ্য নিজের জীবনের সত্য বলেই হয়তো বেশী মনে পড়ে। বেশ কিছুদিন ধরেই আমাদের বাংলাদেশ বিমান আলোচনার বিন্দুতে আছে তার কার্যকলাপের জন্য। সবসময় পেপারে পড়ছি এবং লোকমুখে শুনেই চলছি বিমানের এই দুরবস্থা সাথে যাত্রীদের ভোগান্তির কথা। আমিও বহুদিন ধরে বিমানের এক হতভাগ্য যাত্রী। একটি মোটামুটিভাবে চলন্ত ব্যবসা কি করে অতি লোভীদের হাতে পড়ে দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার রাস্তায় পড়ে বিমান তার একটা খুব উল্লেখযোগ্য উদাহরন হতে পারে। নতুন নতুন অনেক এয়ার লাইনস যেখানে নিজেদেরকে সম্প্রসারিত করছে সেখানে মোটামুটিভাবে প্রায় তিন যুগ দাড়িয়ে থাকা বিমান কেনো আজকে মুখ থুবরে পড়ে যাচ্ছে? সোনার ডিম দেয়া হাসকে একবারে জবাই করে দেয়ার পরিনতি আজ সবার সামনে এসে দাড়িয়েছে। তবে এই পরিনতির ফলাফল আজ সমস্ত জাতি ভোগ করবে, যারা ঐ সোনার ডিম চোখেও দেখেন নি কিংবা তার নাম, গন্ধ কিছুই জানেন না তারাও। বারবার সর্তক করে দেয়াকে আমলে না নেয়াতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখন বিমানের প্রতি কঠোর মনোভাব দেখাতে শুরু করেছেন। সিডিউল প্রবলেম, নিম্নমানের ক্যাটারিং এসব অভিযোগের কারণে বেশ কয়েকটি দেশ অবশ্য আগে থাকতেই বিমানকে তাদের গ্রাউন্ডে নামতে দেয় না এদের মধ্যে আছে নেদারল্যান্ডস এবং লুকেস্মবার্গ। আমাদের নূন্যতম অধিকারের লড়াই দেখা যায় অনেক সময়ই বিদেশীদের কাছে চলে যায় তাদের মধ্যস্থতার জন্য। বিমানের সিডিউল প্রবলেম

হলে যেহেতু বিমান কর্মচারীরা যাত্রীদের ফেলে পালিয়ে যান কিংবা কত সস্তায় যাত্রীদের বিক্রি করে, কতো টাকার ভাউচার সরকারকে দেখিয়ে নিজেরা কতো আদায় করবেন সে হিসেবে ব্যস্ত থাকেন, সেজন্য যাত্রীসেবার নূন্যতম কোটা পূরন না করলে বিমানকে আর ইউরোপে আসতে না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউনিয়ন। এরমধ্যে সিডিউল পরিবর্তন হলে যাত্রীদের খাবারের কূপন দেয়া, যাত্রীদের মিনিমাম থ্রীষ্টার হোটেল দেয়া এবং দেরীর জন্য এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষকে মাশুল দিতে হবে এগুলো হলো ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য শর্ত।

খুব ছোটবেলা থেকেই বিমানের সাথে আমার সম্পর্ক, নিয়তির অনিবার্য কারণে সে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। আমার ছোটবেলা কেটেছে যৌথ পরিবারে যেখানে পড়াশোনা ফাকি দেয়ার এবং অগাধ দুষ্টামী করার আকাশ ছোয়া স্বাধীনতা ছিল শুধু যতক্ষন মায়ের হাতের কাছে না পড়ি। মায়ের হাতের কাছে পড়লে সেদিন অনেক দুর্গতি থাকতো যদিও তেমন দুর্ঘটনা খুব সহসা ঘটতে পারতো না, সারা বাড়ী ভর্তি লোক প্লাস দাদুতো আছেনই। মায়ের হাতের কাছে দৈবাৎ পড়লেও যদি কোন রকমে গলার আওয়াজ দাদুর কান পর্যন্ত পৌছত তাহলেই নিশ্চিত বরং তখন আমরা দাড়িয়ে মায়ের বকা খাওয়ার দুর্গতি দেখতাম দাদুর কাছে। আমার এখন মনে হয়, হয়তো বাবার উপরে মা কোন কারণে রেগে থাকলে কিংবা জায়েদের উপরের রাগ বা দাদুর বকার ঝাঝও মা আমাদের পিঠে তখন মেটাতেন। কিন্তু আমাদের এতো সতর্কতার মাঝেও মাঝে মাঝে এ দুর্ঘটনা ঘটে যেতো এবং মা তার হাতের সুখ আমাদের পিঠে করে নিতেন। দুর্ঘটনা মারাত্বক হলে এই দুর্ঘটনার খবর তখন আমার বাবার কান পর্যন্ত পৌছতো তাতে অবশ্য সবসময়ই আমরা পরে লাভবান হতাম। এইসব লাভের মধ্যে তখন একটা বিরাট লাভ ছিল রোজদিনের একই রুটিনের বদলে এদিক সেদিক বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, ভালো কিছু খাওয়ানো কিংবা একটা ভালো খেলনা কিনে দেয়া। তবে এসব আদরের সবোর্চ্চ ডিগীটা ছিল "তোদের প্লেনে করে বেড়াতে নিয়ে যাবো" এটা। অমাদের মধ্যবিত্ত সংসারে একসাথে কয়েকজনকে প্লেনে চড়ানো সহসা হয়তো খুব সোজা ছিল না বাবার পক্ষে কিন্তু তিনি তাও মাঝে সাঝে করতেন। নিজের ছোটবেলায় বাবা হারানো বাবা আমার উদয় অস্ত পরিশ্রম করার জন্য ছেলেমেয়েকে যেহেতু সময় দিতে পারতেন না সেটা কম্পেনসেট করার চেষ্টা করতেন একবারেই দামী কিছু দিয়ে। সেই থেকে বিমানের সাথে আমার পরিচয়। বছরে কিংবা দুবছরে একবার ঢাকা-সিলেট-ঢাকা অথবা ঢাকা-চিটাগাং-ঢাকা এই পর্যন্তই দৌড় ছিল আমাদের কিন্তু তখন তাই কতো ভালো লাগত। বিশ্ব-ব্রক্ষান্ড জয়ের আনন্দ ছিল তার মধ্যে। বিমানের সাথে সাথে এয়ারপোর্টের সাথেও ছিল আত্মার সর্ম্পক। তখন ঢাকা এতো ব্যস্ত শহর না, আধ ঘন্টা ড্রাইভ করলে ধানমন্ডি থেকে কুর্মিটোলা পৌছানো যেতো। মাঝে মাঝেই খুব সকালে বাবা আমাদের সব ভাইবোনদের তুলে গাড়িতে ভরে রওয়ানা দিতেন কুর্মিটোলা, ফ্রেস হাওয়া খাওয়াবেন আমাদেরকে, আর আমাদের ব্যায়াম করাবেন সেখানে। এয়ারপোর্টের আশ-পাশ তখন ফাকা শুধু ধু ধু জমি চারপাশে। তখন এয়ার্পোর্টের কাজ চলছে। তখন নাম ছিল নতুন এয়ারপোর্ট আর পুরনো এয়ারপোর্ট। বাবা আমাদের নিয়ে এক ড্রাইভওয়ে দিয়ে উঠে অন্য ড্রাইভওয়ে দিয়ে নামতেন, আমাদের এত্তো ভালোলাগতো, আমরা বাবাকে প্রায় সারাক্ষন বলতে থাকতাম আব্বু আর একবার আর একবার, আর গাড়িতে থাকা আমার অন্য চাচাতো ভাইবোনরা বাবাকে বলতো মনাকাক্কু আবার আবার।

আস্তে আস্তে এগুলো কেনো জানি সব বন্ধ হয়ে গেলো। নদীতে অনেক স্রোত আর সময়ও বয়ে গেলো। যৌথ থেকে আমরা সবাই আলাদা হলাম। কুর্মিটোলা হারিয়ে গেলো। পরীক্ষায় ভালো রেজালট করলে

প্লেনে চড়ানোর হাজার প্রমিস করতেন বাবা কিন্তু সকালে সিলেট যেয়ে বিকেলে ফিরে আসার এ্যডভেঞ্চারও আর কোন আগ্রহ তুলে না মনে। সেগুলো তখন "ছোটবেলা" নামক কমায় বন্দী অথচ বাইরে হাজারো ভালো চকলেট খাওয়া সত্বেও ফ্লাইটে দেয়া চকলেটগুলো একসময় অমৃত মনে হতো, দুটো হয়তো প্লেনে খেতাম আর দুটো বাড়িতে আস্তে আস্তে খাবো বলে নিয়ে আসতাম। আর এয়ারহোস্টেসদেরকে মনে হতো স্বর্গের অপ্সরা দাড়িয়ে আছেন। এতো মিষ্টি করে হাসতেন আর নরম করে কথা বলতেন যে সারাদিন তাদের ছবিই চোখে ভাসত। দিনরাত এয়ারহোস্টেস হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম তখন। সেজে গুজে পরী হয়ে দেশ দেশান্তরে উড়ে বেড়াবো। ছোটবেলায় আমাদের কালে একটা কমন ব্যাপার ছিলো বাড়িতে মেহমান এলেই ডেকে জিজ্ঞেস করা ক্লাশে রোল নম্বর কতো আর বড় হলে কি হতে চাও? মনে মনে হয়তো ভীষন হতে চাইতাম রাস্তার ফুচকাওয়ালা, সিনেমার সুন্দরী গান গাওয়া নায়িকা কিংবা এয়ারহোস্টেস কিন্তু বাবা-মায়ের ভয়ে সাধারণত তারা কি রুপে দেখতে চান সেটাই বলতে হতো। তেজগায়ের সেই লোহার ছাদ দেয়া বিমানবন্দর থেকে হেটে বেরিয়ে আসার সময় তখন অনুভুতি থাকত আমাদের "নাসা"র নভোযান থেকে বেরোনোর মতো। পার্থক্য শুধু থাকতো নাসার যাত্রীরা থাকেন তাদের মহাশূন্যে ভ্রমনের বিশেষ পোষাকে আর আমরা থাকতাম প্লেনে চড়ে বেড়াতে যাওয়ার বিশেষ পোষাকে। এতোকিছুর পরও বিমান একসময় তার সমস্ত চার্ম হারিয়ে আমাদের জীবন থেকে সাময়িক বিদায় নিলো কিন্তু নিয়তির অনিবার্য কারণে ধূমকেতুর মতো উদয় হোল আবার। প্রবাসী ছেলের সাথে বিয়ে হওয়ার কারণে আবার বিমানের সাথে গাটছড়া বাধা হলো আমাদের, আমার তথা আমার পুরো পরিবারের, আর এবার পুরো পাকাপাকিভাবে। মেয়ে রান্না-বান্না পারে না, মেয়ে এটা খেতে কিংবা ওটা খেতে ভীষন ভালোবাসতো, বিদেশে সব ধরনের দেশী শাক-সব্জি পাওয়া যায় না, কখনও পাওয়া গেলেও তা ফ্রেস না ইত্যাদি নানা অজুহাতে আমার বাবা-মা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বিমানের পাইলট, ক্রু সহ যখন পরিচিত যাকে পেতেন তাকে ধরে বেধেই খাবার-দাবার, বই-পত্র, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি পাঠাতেন আমাদের জন্য। বাবা তার বন্ধু-বান্ধব, নিকট আত্মীয়, দূরের আত্মীয় সব জায়গায় গরু খোজা খুজে সপ্তাহে সপ্তাহে লোকজন সেট করে ফেললেন তার মেয়ের জন্য। ক্রু'রা যতভালো তাদের রোস্টার না জানতেন আমার বাবা জানতেন তাদের চেয়ে ভালো। হায়রে সন্তান স্নেহ। প্রথম প্রথম প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহেই চালান আসতো, আস্তে আস্তে সেটা অবশ্য অনেক কমেছে। আর এই বিমান থেকে প্রতি সপ্তাহে আমার খাদ্য-দ্রব্য, জিনিস-পত্র সংগ্রহ করতে যেয়ে যেয়ে, পাইলট - ক্রুদেরকে ব্রাসেলস থেকে এন্ডহোভেন আনা নেয়ার ফাকে ফাকে অনেকের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠতাই আমাদের হয়ে গেলো এবং এর ফলে অনেক ছোটখাটো জিনিসই জানতে বা দেখতে পেয়েছি যা অনেকেই হয়তো জানেন না। তার খুব সামান্য ছোট-খাটো নমুনাই আজকের লেখার বিষয়।

আমাদের দেশের সরকার প্রধান বা নীতি নির্ধারকদের ধারণা বিদেশে এসে অজস্র পয়সা হোটেল, গাড়ীতে ব্যয় করলেই বিদেশীদের কাছে সম্মান পাওয়া যায় বা তাদের সমান হওয়া যায়। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হল্যান্ডে এসে সমুদ্র সৈকত স্ক্যাভিনিঙ্গের তৎকালীন সবচেয়ে দামি হোটেল "হোটেল খুরহাউজে" ছিলেন। যে স্যুটে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন ছিলেন সেই সমমর্যাদার স্যুটে তিনিও ছিলেন। এ নিয়ে আমি এ্যম্বেসীর কাউকে প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিলেন, " বাংলাদেশ গরীব দেশ হতে পারে কিন্তু তার রাষ্ট্রপ্রধান যদি বিদেশে এসে কৃচ্ছতা সাধন করেন, সস্তার হোটেলে থাকেন তাহলে তার সম্মান কোথায় থাকে? এ্যমেরিকার আর বাংলাদেশের রাস্ট্রপ্রধানের হোটেল স্ট্যাটাসতো কমপক্ষে একথাকা উচিত। " হোটেল এক হলেই যদি স্ট্যাটাস এক হতো তাহলে হয়তো আজ পৃথিবী অন্য সুরে গাইতো।

আমাদের রাজকীয়ও বিমানের সেই হাল। পৃথিবীর অন্যান্য এয়ারলাইনসের তুলনায় বিমানের স্ট্যাটাস যাই হোক না কেনো বিমানের ক্রুদের হোটেল বুকিং থাকে সবসময় ফাইভ স্টার হোটেল হিলটনে। অন্যদিক বিমান কখনও নষ্ট হলে বিমানের যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয় ষ্টার ছাড়া সবচেয়ে সস্তার হোটেলে, কখনও বা তাও না, এয়ারপোর্টেই ফেলে রাখা হয়, বিমানের যাত্রা দেরী হলে খাবার কূপন পাওয়া যায় না মায় বিমানের কোন কর্মচারী / কর্মকর্তা সারা এয়ারপোর্টে খুজে পাওয়া যায় না কিন্তু তাদের নিজেদের হিসাব থাকে সাড়ে ষোল আনার উপর। তাতেও আপত্তি করতাম না যদি সেটাও তারা সঠিকভাবে ব্যয় করতেন। একটা কৌতুক প্রায়ই শুনি যে বাংলাদেশীদের যে দোযখে রাখা হবে সেটাতেও অনেক আরাম কারণ দোযখের মধ্যেও পাপীরা দোযখের কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে নিজেদের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। বিমান কর্মচারীরা এই ব্রাসেলসও সস্তার জায়গাতে সস্তার হোটেল খুজে নিয়েছেন নিজেদের থাকার জন্য। আমি দোয়া করি এই জায়গায় আর হোটেলে যেন কখনও পুলিশ রেড না পরে তাহলে অনেক বিমান কর্মচারীরই ঘর সংসার নিয়ে টান দিবে। হয়ত বিনাদোষেই বেচারারা স্ত্রী হারা হবেন আর স্ত্রীরা স্বামীহারা। পেপারে যদি কোন জায়গায় তারা থাকেন এবং তার আশে পাশে কি ঘটে তা রং চং দিয়ে প্রকাশিত হয় তাহলে অনেকের বউ বা স্বামীই হয়তো তাদের পার্টনার নির্দোষ এ কথা বিশ্বাস করতে চাইবেন না । তারা নিজেরা বাংলাদেশ থেকে হাড়ি-পাতিল, বটি, কড়াই সব নিয়ে এসেছেন, এখানে তারা নিজেরা রান্না করে খান, হোটেলেই ডিশের সংযোগ নিয়েছেন জী টিভি, সনি টিভি কি নেই সেখানে, Little Bangladesh. সরকার পথ খরচা বাবদ (হিলটন বিল) যা দেন প্রায় পুরোটাই থাকে উনাদের পকেটে। এমনিতে বাঙ্গালীদের মধ্যে অন্যান্য ব্যাপারে মিলমিশের অভাব থাকলেও চুরির ভাগাভাগি নিয়ে অমিলের কথা খুব একটা কোথাও শোনা যায় না। এ জায়গায় সবাই ভাই ভাই। এধরনের চুরিতে বাঙ্গালীরা এতো সিদ্ধযে এগুলোকে আজকাল আর চুরি বলেই কেউ ধরেনা, এগুলো হলো ওপেন সিক্রেট। ফরেন সার্ভিস জয়েন করার আগে সিলেক্টদের সরকার "এটিকেট" শেখার টেনিংএ বিদেশে পাঠান, তাদের কথা থাকে এখানে তারা রাজকীয় পরিবেশে মিশবে এবং সেগুলো নিজে আত্মস্থ করে যাবে এবং তারপর ডিউটি জয়েন করবেন। কিন্তু দেখা যায় তারা এ্যম্বেসীতে এসেই সস্তায় কোথায় থাকা যায়, কার বাড়ির গ্যারেজ অথবা চিলেকোঠা খালি আছে তা যোগাড় করে ফেলেন। সারাদিন আড্ডা দেন মাছের দোকানে বসে, পার্ট টাইম কাজও জুটিয়ে ফেলেন কোন রেষ্টুরেন্ট কিংবা দোকানে। সরকারের দেয়া টাকাতো পুরোটা জমিয়েই রাখেন সাথে নিজে উপড়ি কতো রোজগার করতে পারেন সেই ধান্ধায় থাকেন। রাজকীয় পরিবেশে "এটিকেট" শেখার বদলে দেখা যায় অশিক্ষিত লেবারদের সাথে পুরোটা সময় ধান্ধাবাজিতে কাটিয়ে দিয়ে পকেট ভরে ডলার নিয়ে যান। এরপর যখন ডিউটি জয়েন করেন দেখা যায় কোথায় কোন পোষাক পড়ে যেতে হবে দেখা যায় সেটাও জানেন না।

এবার বিমানের ক্রুদের অন্যধরনের চুরি আর তার ফলাফল দেখি। আমার বাবার বাসা ঢাকার যে প্রান্তে অবস্থিত বিবিসিতে শুনেছি আর লোকমুখেও শুনি সেখানে নাকি সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকজন বসবাস করতে পারেন না তার একটা মূল কারণ বাড়িভাড়ার অগ্নিমূল্য । আমার বাবার সাথে পরিচয়ের সূত্র ধরে আমার বাবার বাসার একটি ফ্লোর একজন বিমানের ক্রু ভাড়া নেন এবং দীর্ঘ দশ বছর তিনি সেখানে ভাড়া থেকে নিজে আরো অভিজাত এলাকায় বিলাসবহুল এ্যাপার্টমেন্ট কিনে এখন চলে গেছেন। তার আদি বাড়ি ও আমাদের আদি বাড়ি কাছাকাছি গ্রামে, তিনি যখন আমাদের বাড়ি ভাড়া নেন তখন মাত্র দুই কি তিন বছর তিনি বিমানে কাজ করছেন। আমাদের বাড়ির এই ফ্ল্যাটে তিনি, তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে থাকতেন সাথে তার মা-বাবা ও ছোট ভাই-বোন। তার পুত্র-কন্যা অবশ্যই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে, বাবা-মা বৃদ্ধ তাদের

ঔষধ পত্রতো আছেই, সাথে ছিল ছোট ভাইদের পড়ার খরচ, ছোট বোনকে বিয়ে দেয়া ইত্যাদি নানাকিছু। এ সমস্ত দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সম্পাদন করেছেন যা কোন উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ীর পক্ষেও হয়তো এভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। তবে এই দশ বছর আমাদের বাসার কোন ফ্ল্যাটের অন্য কোন ভাড়টের কোন জুস, দুধ, সিগারেট, পারফিউম, মাখন, মধু, সাবান ইত্যাদি আরো জিনিস বাইরে থেকে কিনে ব্যবহার করতে হয়নি, সব চারতলায় কিনতে পাওয়া যেতো। তাও আবার ওরিজিন্যাল বিদেশী, গ্যারান্টেড বাইরে থেকে কিনলেতো নকল- ভেজালের সম্ভাবন থাকেই তাছাড়া হাতের কাছে থাকতে দূরে যাওয়ার দরকারইবা কি? ক্রুসাহেব অবশ্য বলতেন উনি এগুলো ইউরোপ / এ্যামেরিকা / দুবাই থেকে কিনে নিয়ে দেশে বিক্রি করেন কিন্তু এর সবটাই কি কিনে নিয়ে বিক্রি না অন্য কিছু এটা বোঝার মত সাধারণ বুদ্ধি সকলেরই আছে কিন্তু এটা নিয়ে কারো কোন মাথা ব্যাথা ছিল না। অন্যায় দেখতে দেখতে অভ্যস্ত মানুষজন আমাদের দেশে আর কোন কিছু নিয়েই অবশ্য আর আজকাল মাথা ঘামান না। যাইহোক শুধু বাসার ভিতর বিক্রি দিয়েতো উনার চলে না, প্রতিটি দূরপাল্লার ডিউটির শেষে উনি আসতেন প্রচুর মালামাল নিয়ে, যে দু-তিন দিন উনার রোস্টার ফ্রি থাকতো রেষ্টের জন্য, সেকদিন উনি থাকতেন মহাব্যস্ত। বস্তায় ভরে ভরে এ সমস্ত মালামাল সব দোকানে দোকানে পৌছে দিতে হতো। আমাদের বাসা থেকে নিজের এ্যাপার্টমেন্টে যাওয়ার সময় উনি পুরনো কোন ফার্নিচার এবাসা থেকে নেন নি সাথে, নতুন ফ্ল্যাটের মাপ এবং স্ট্যাস্টাসনুযায়ী সব নতুন করে তৈরী করেছেন, শোনা যায় উনি গ্রামের বাড়িতেও পাকা ঘরবাড়ি করেছেন আর পুরনো সমস্ত ফার্নিচার গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন । অনেকের ধারণা যতটাকা উনি ফ্ল্যাট কিনতে ব্যয় করেছেন মোটামুট তার কাছাকাছি টাকা তিনি ফ্ল্যাট সাজাতেও খরচ করেছেন। সব বিদেশী ফিটিংসের কিচেন, বাথরুম, ল্যাম্পশেড প্রভৃতি যা হয়তো বিদেশে থেকেও লোকজন অনেকসময় এফোর্ড করতে পারে না। আমার এক বিদেশী বন্ধু বাংলাদেশে যেয়ে সেখানকার লোকজন নগ্দ টাকায় বাড়ি কিনে শুনে চোখ কপালে তুলে ফেলেছিল, এতো টাকা একসাথে নগদ লোকে কোথায় পায় তাও এতো গরীব দেশে! চাকরি করে খেয়ে বেচে লোকের কটা টাকাই বা জমে যে নগদ পুরো টাকা দিয়ে বাড়ি কেনে? কিন্তু ইউরোপের চাকরীর হিসাব আর বাংলাদেশের হিসাব বোধহয় এক নয়। বাংলাদেশ বিমানে মাত্র পনর বছর চাকুরী করলে যা পাওয়া যায় কে।এল।এম কিংবা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে সারাজীবন চাকরী করেও হয়তো তা সম্ভব না। বিমানে কেউ একটা ডায়েট কোক খেতে চাইলে উত্তর পাওয়া যায়, "নাই, ফুরিয়ে গেছে" সেই ডায়েট কোক পাওয়া যাবে "উইম্পিতে" আশি টাকায়। মাঝে মাঝে বিমানের লেবেল শুদ্ধও দোকানে অনেক জিনিস কিনতে পাওয়া যায়। আমার এক কাজিন একটি বুটিক খুলেছে যেখানে সেই ক্রু সাহেবের মিসেস প্রায় যান শপিং করতে, আমার কাজিন প্রায় ফোন করে আমার মাকে বলেন এরকম পাচটা কাষ্টমার পেলে ব্যবসা নিয়ে তার আর কোন ভাবনা নেই, আর কোন ভাড়াটে যদি এমন থাকে আমার মা যেনো অবশ্যই অবশ্যই তার বুটিকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন। বুটিকে যেয়ে ক্রুর মিসেস দাম দেখে কেনাকাটা করেন না। তিনি আগের দিনের জমিদারদের মতো সাথে (লোক) বুয়া নিয়ে যান বুটিকে আর শুধু আঙ্গুল তুলে দেখাতে থাকেন কোনটা আর কোনটা। কাপড়, বিছানার চাদর, কুশন-কভার, শাল ইত্যাদি , বুয়া সব একপাশে জমাতে থাকে। আগে পছন্দসই সব তোলো তারপরতো বিলের প্রসংগ। রাজকর্মচারীদের রাজকীয় জীবন।

এতো গেলো ক্রুদের কথা, পাইলটরা কি করেন। আজকাল যেখানে অনেক অনেক নামী দামী প্রতিষ্ঠিত পেশাজীবিরা নিজেদের পৈতৃক আবাসভূমিগুলো ডেভেলেপারদের হাতে দিয়ে দিচ্ছেন নিজেরা আর ব্যয় কুলাতে পারছেন না বলে সেখানে বিমানের পাইলটরা যেভাবে গুলশানে, বারিধারায় নিদেন পক্ষে উত্তরায়

নিজেদের আস্ত বাড়ি হাকিয়ে বেড়ান তাতে খুব ছোট একটা প্রশ্ন মনে আসে ভাইজানদের বেতন কতো মাসে? ছেলে পড়ছে এ্যামেরিকায়, মেয়ে হয়তো আই।ইউ, বিতে, বউ সামার শপিং এ ব্যঙ্ককতো উইন্টার শপিং এর জন্য লন্ডন। অসুখ হলে এ্যাপোলো, গিফট কিনতে শপার্স ওয়ার্লড, খেতে গেলেই পিজ্জা হাট কিংবা টপকাপী, বেড়াতে বেড়োলেই মরিশাস বা জুরিখ। এগুলো আসে কোথা থেকে? কতো টাকা বেতন পান বিমানের পাইলটরা? হুম যখন পেপারে দেখি ডায়া গোলড বা ডায়মন্ড সেন্টারে কখনও রেড পড়েছে, এতো সব দামী দামী গয়না, পাথর, ডায়মন্ড এগুলো বিনা শুল্কে আর বিনা রেজিস্ট্রি ছাড়া কি করে দোকানের শোকেস পর্যন্ত পৌছলো তার তদন্ত চলছে, তখন অবশ্য বেশ কদিন আশায় পেপার দেখতে থাকি হয়ত জানতে পারব কোথা থেকে এলো ঐগুলো, সেটা জানা অবশ্য আর হয় না কারণ তদন্ত আর সে পর্যন্ত আগায় না। আরো বহু জিনিস আছে যা বিনা শুল্কে এবং বিনানুমতিতে তাদের হাত ধরে এমনসব দোকানে পৌছে যায় যা সাধারণ কেনো বহু অসাধারণ জনগনেরও কল্পনার বাইরে থাকে। সে সব অবশ্য সাধারণ লোকদের জেনে দরকারও নেই কারন সে সব তাদের কোন কাজেও লাগে না। এসব সব বড় বড় মানুষদের ব্যাপার ।

এতো গেলো অপারেটিং লেভেলের চুরি, অফিস কর্মকর্তারাই বা পিছিয়ে থাকবেন কেনো? সবারইতো ভাবটা এমন ও করছেতো আমি করবনা ? বিমানের যে অফিসগুলো দেশের বাইরে আছে তাদের একমাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ হলো টিকেট সেল করা আর বিমান যদি সেই দেশে ল্যান্ড করে তাহলে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং করা তবে সেটা সে দেশের এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষও করতে পারেন যদি সেভাবে কন্ট্রাক থাকে। কিন্তু দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক দেশেই বিমানের একটা করে বড় অফিস থাকে তাতে বেশ কজন কর্মচারী থাকেন, তাদের কাজ কি, এই মাথাভারী প্রশাসন কি করেন কেউ তা জানেন না। একজন কান্ট্রি ম্যানেজার, একজন ফাইনানস ম্যানেজার, ক্লার্ক, ড্রাইভার, ষ্টেশন ম্যানেজার, রিসিপসনিস্ট কি নেই তাদের? আন যায়ে যায় মাগার শান না যায়। ম্যানেজারে ম্যানেজারে সয়লাব। নেদারল্যান্ডসের পুরো দেশের বাজেটের চেয়ে ফিলিপসের বাৎসরিক বাজেট কয়েকগুন বেশী, তারপরও ফিলিপস যা এফোর্ড করতে পারে না বিমান তা অবলীলাক্রমে পারে। শুনেছি নেদারল্যান্ডস এর সরকারী বিমান সংস্থা কে-এল-এম বাংলাদেশ বিমানের সেবা তাদের নজরে আপ-টু-দি স্ট্যান্ডার্ড না হওয়ায় ১৯৯৫ সাল থেকে বাংলাদেশ বিমানের নেদারল্যান্ডসে অবতরন নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছেন এবং নেদারল্যান্ডসের সমস্ত ট্র্যাভেল এজেন্টকে বিমানের টিকিট বিক্রির উপরও নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। নেদারল্যান্ডস এ বিমানের কোন ব্যবসা নেই, কাজ নেই, শুধুমাত্র সারা বৎসরে হয়তো দশটা টিকিট বিক্রি করা ছাড়া তারা আর কোন ধরনের ব্যবসায়িক কোন কর্মকান্ড এখানে চালান না কিন্তু বিমান অফিসটি বহাল তবিয়তে আছে এখানে, নেদারল্যান্ডসে বাধা প্রাপ্ত হয়ে বিমান রুট পরিবর্তন করার সাথে সাথে বেলজিয়ামে আরো একটি নতুন অফিস খোলা হয়েছে। প্রতি তিন বছর কিংবা পাচ বছর অন্তর অন্তর সেখানে নতুন নতুন ম্যানেজার আসেন তাদের কেউ কেউ আবার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পুরো পরিবার নিয়ে অবৈধভাবে ইউরোপে থেকেও যান কিন্তু তারা বিমানের কি কাজ করেন এটা এখানের অনেকেরই আজানা। তবে মন্ত্রী বা সচিব লেভেলের কেউ আসলে তাদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অনেক দৌড়াদৌড়ি করেন, ঘোরান, শপিং করে দেন সে সমস্ত কাজগুলো অবশ্য আমাদের অনেকেরই জানা। বিমানে নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম থেকে সপ্তাহে হাতে গোনা দশ থেকে পনর জনও হবে কিনা সন্দেহ যাত্রী ট্র্যাভেল করেন তারজন্য এতো নিধিরাম সর্দার কেনো?

অটোমেটিক সিস্টেম, অল লাইন বুকিং এর যুগে যেখানে ব্যঙ্গালোরে বসে একজন নেদারল্যান্ডসের জব খেয়ে দিচ্ছেন সেখানে উনারা মাসে দশটি টিকেট সেল করার জন্য জায়গায় জায়গায় অফিস নেন!! যেখান থেকে উনাদের অফিস ভাড়াও ওঠে না (ওনাদেরই ভাষ্য) সেখানে এই বিলাসিতা বছরের পর বছর চলে কার পয়সায়? বিদেশে আসার জন্য সিরিয়াল ঠিক করা থাকে কার আগে কে আসবে। ধরাধরি, স্বজনপ্রীতির একসা করে বাইরে পোষ্টিং নেয়া হয় কেনো, কিসের জন্য? বাইরের ট্রিপ শেষ করে দেশে গেলেই দেখা যায় ভাড়ার বাড়ি থেকে শিফট করে নতুন ফ্ল্যাটে চলে যাচ্ছেন, অনেকে সাথে নতুন ওয়াশিং মেশিন, ওভেন, ভিডিও ক্যামেরা, ডিজিটাল ক্যামেরা আরো কতো কি? সব বিদেশ থেকে আনা, এগুলো আসে কোথা থেকে? আয় নেই বলে শুনেছিলাম আমর্ষ্টাডামের অফিস বন্ধ করে দেয়া হবে তাতো হয়ইইনি বরং ব্রাসেলসে আরো একটি নতুন অফিস খোলা হয়েছে এবং এও শুনতে পাই দেশের বাইরে আরো বেশী বেশী অফিস খোলার জন্য অনেকে অনেক অনেক তদ্বীর চলতে থাকে সারা বৎসর উপরের লেভেলে। অনেক সময় ভুয়া সেলস রিপোর্ট এবং তথ্যও দেয়া হয় অফিস খোলার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে। অফিস খুলিয়ে সরকারের লোকসান করিয়ে, নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন আর কতদিন চলবে? অফিসের নানারকম ভূয়া খরচ দেখানো, ভূয়া ওভারটাইম, চারজন এক ফ্ল্যাটে ভাড়া থেকে পৃথক পৃথক ভূয়া বাড়ি ভাড়ার বিল দেখানো হয়। সবাই যেহেতু জড়িত দুশ্চিন্তার কিছু নেই। যে অফিসে মাসে দশখানা টিকিট হয়তো বিক্রি হয় না দেখা যাবে সেখানেও সাত জন ওভারটাইম করেছে, উইকেন্ড, উইকডেজ সারাবৎসর। অফিসে ফোন করলে অবশ্য শুনতে পাওয়া যায় স্যার বাচ্চাকে আনতে স্কুলে গেছেন, বাসায় বাচ্চাকে রেখে একবারে লাঞ্চ সেরে ফিরবেন। লোকমুখে শুনি বিমানের এইসব সাব অফিসদের মানে দেশের বাইরের অফিসগুলোকে প্রতি বছর অতিথি আপ্যায়ন খরচ দেয়া হয়, যারা সবসময় বিমানের টিকিট কাটেন তাদেরকে সম্মান করা এবং অন্যদেরকেও বিমানে ভ্রমনে উৎসাহিত করার জন্য এ টাকা খরচ করার কথা। এ টাকার পরিমান কিন্তু নেহাত কম নয়। প্রায় বারো হাজার ইউরো। কেউ বিমানের লোকদের দ্বারা আপ্যায়িত হয়েছেন কিংবা বিমান অফিসে এ ধরনের পার্টিতে যোগ দিয়েছেন বলে আজোও জানা নেই। কিন্তু কিছু রেষ্টুরেন্টের যোগসাজশে ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে এই পয়সা প্রতিবারই সরকারের কাছ থেকে আদায় করা হয় সে খবর শুনতে পাই।

কদিন আগে পত্রিকাতে একটা মজাদার নিউজ পড়লাম, কিছু সংখ্যক বিমানের এয়ারহোস্টেস নাকি তাদের ডিউটির সময় প্লেনে কাজের লোক সমেত বাচ্চা নিয়ে ডিউটি করেন!!! জাপান থেকে আগত এক যাত্রী পত্রিকা অফিসে যেয়ে সুনিদিষ্ট অভিযোগ করেন যে এটা শুধু একবার নয় বেশ কবার উনি দেখেছেন এবং উনার বন্ধুরাও দেখেছে। দরকারে ডাকলে তাদের পাওয়া যায় না কারণ তারা বাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত তাছাড়া এলেও যাত্রীদের সাথে বেশ দুর্ব্যবহার করেন। আহারে নিজ দেশের প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে কতই না আরাম। নিজের সুবিধান্যযায়ী এন্ডা-গেন্ডা নিয়ে ডিউটি করা যায়। সবতো নিজেদেরই লোক যাকে বলে বলে ঘরে ঘরে ব্যাপার, হোক না ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট অসুবিধা কি?

বিমানের নিউইর্য়ক ফ্লাইটটি উনত্রিশে জুলাই তার শেষ যাত্রা সম্পন্ন করে চলে গেলো, প্রবাসীদের হাজার অনুরোধেও কান না দিয়ে ফ্লাইট বন্ধ করে দেয়া হলো। জ্বালানী তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে লোকসান আর বিমানের শিডিউল ঠিক রাখার জন্য আপাতত তাদের যথেষ্ঠ বিমান নেই এই অজুহাত দিয়ে। তবে তারা প্রবাসীদের মনে আশার আলো জ্বেলে রেখে গেছেন আবার যেদিন যথেষ্ঠ বিমান তাদের মজুদে আসবে সেদিন বিমান আবার মাথা উচু করে নিউইর্য়কের আকাশে উড়বে। যদিও নিউইর্য়ক তাদের আকাশে আবার

বিমানকে ঢুকতে দিবে কিনা সে নিয়ে স্বয়ং বিমান অথরিটিরই প্রচুর সন্দেহ আছে কারণ দুই দেশের অথরিটির মধ্যে সম্পর্ক হয়তো নানা কারণে ততোটা মধুর ছিল না। একবার বন্ধ হয়ে যাওয়া জিনিস আবার চালু করা কতটা দুরুহ তার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ বিমানের অবশ্যই আছে। আজো বন্ধ হয়ে যাওয়া ঢাকা-আমস্টার্ডাম ফ্লাইট পুনঃ চালু হয়নি বহুবার এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যদিও বিমান এখনো হাল ছাড়েনি বলে অফিস নিয়ে বসে আছে । জ্বালানী তেলের দাম দিনে দিনে আরো বাড়বে ছাড়া কমবে বলে মনে হয় না সে কথা বিমান ভেবেছে কিনা কে জানে। নাকি ভাবছে তেলের দাম যেদিন কমবে সেদিন থেকেই আবার বিমানের নিউইর্য়ক ফ্লাইট আবার চালু দিবে। আর বিমান চালানোর জন্য যে তাদের যথেষ্ঠ বিমান সংগ্রহে নেই তারমধ্যে নতুন বিমানযে তাদের কাছে একেবারেই নেই সেটা তাদের চেয়ে আর আমাদের মতো ভুক্তভোগীদের চেয়ে ভালো আর কে জানে? যে এয়ারপোর্টেই আমাদের বিমান মাশাল্লা একবার নামে আবার সে দেশের ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে সার্টিফায়েড হয়ে ফিরে কখন উড়বে আকাশ সে আশা ছেড়ে দিয়েই নামে। বিমানের নিউইয়র্ক ফ্লাইট যে বন্ধ হবে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সে সংবাদ বহুদিন ধরেই প্রচার করা হচ্ছিল কিন্তু তাহলে বিমান বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে তাদের ব্রাসেলস, নেদারল্যান্ডস এবং নিউইর্য়ক অফিস বন্ধ করা হলো না কেন? তারা কি জানতেন না এ খবর? নাকি প্রস্তূত হওয়ার সুযোগ পাননি এ কমাস ধরে? আদৌ বিমান আবার এ রুটে চলবে কিনা সেই সন্দেহ মাথায় রেখে তারা বসে আছেন এখানে কোন লজ্জায়? যদি এদিকের কেউ বিমানে ভ্রমন করেন তাহলে তাহবে ভায়া লন্ডন কিংবা ফ্রাংকফুট অথবা প্যারিসের মাধ্যমে। আর সেই টিকিট যোগান দেয়ার জন্যতো ফোন, ফ্যাক্স, ইমেইল, পোস্ট নিদেনপক্ষে আমাদের মাছের দোকানের সাথে যুক্ত ট্র্যাভেল এজেন্ট ভাইরা আছেনই, তাহলে তাদের কাজটা কি হবে? যেখানে পর্যাপ্ত টাকা নেই বলে সরকার জাতীর বিবেক যারা তৈরী করেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যত যাদের হাতে তাদের সেই শিক্ষকদেরকে বেতন দিতে পারছেন না বলছেন, দেশ চালানোর মতো যথেষ্ঠ টাকা সরকারের কাছে নেই বিধায় অর্থমন্ত্রী ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছেন বলে পেপারে পড়ি সেখানে এই ধাস্টামো চলছে কার পয়সায়?

এ যখন অবস্থা উনাদের তখন মাঝে মাঝে যখন আমাদের লাগেজের ওয়েট দু/চার কিলো বেশী হয়ে গেলে বিমানের কমর্চারীরা উপদেশ দেন, "ম্যাম এটা অন্যায়, আপনার অতিরিক্ত মালের জন্য আমাদের অতিরিক্ত তেল খরচ হবে, সেটা লোকসান হবে বিমানের" তখন হাসবো না কাদবো বুঝতে পারি না। এইডস হয়ে যাদের সারা গায়ে ঘা হয়ে, মাথার সমস্ত চুল পড়ে গেছে তারা যদি আমাদেরমত সাধারণ খোস-পাচড়া চুলকানির রোগীকে বলেন এটা অন্যায় তাহলে কই যাই ??? দু/চার কিলো ওয়েট এক্সেজ এ্যালাও করেনা এমন এয়ার লাইনসের মুখোমুখি এখনও অবশ্য আমি হয়নি। তারা কিভাবে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করে সেটা শেখার সময় এখন বিমানের হয়েছে নিশ্চয়ই। যেখানে অন্য এয়ার লাইনসে চার জন থেকে ছ জন ডিউটিতে থাকে তখন দেখা যায় আমাদের বিমানে ক্রু সংখ্যা আট থেকে দশ জন মাঝে মাঝে বারও হয়। সেটা অন্যায় না বোধহয়। যেখানে এমিরেটস, সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস, কুয়েত এয়ারওয়েজ, মালোশিয়ান এয়ারলাইনস মাত্র ছশো ইউরোতে ঢাকা - আমর্স্টাডাম - ঢাকা টিকিট দেন, ব্রিটিশ এয়ারলাইনসের হাই সিজন রেট থাকে সাতশ পনের ইউরো, সেখানে অফ আর অন সব সিজনেই আটশ পয়তাল্লিশ ইউরোতে টিকিট বিক্রি করে বিমান এবং প্রত্যেকটি ফ্লাইট ফুল থাকে তারপরও তাদের লোকসান হয়!!!

কিন্তু আমাদের সাধারণ জনগনের মনে যত কস্ট আর আপত্তিই থাকুক বিমানের চালচলন নিয়ে, আমি জানি ছেলে বিমানে চাকরী পেলে বাংলাদেশে বাবা-মায়েরা কি প্রচন্ড সুখী হন, তাদের সোনার ছেলেদের এমন সোনার ভবিষ্যত দেখে। গর্ব করে সবাইকে বলতে পারেন হ্যা, কাজ করে বটে আমার ছেলে। কজনার হয় এমন দ্রুত এতো উন্নতি? বিমানে চাকরী করা ছেলেদের বাবা-মায়েরা বোধ হয় যুগে যুগে ছেলে এমন চাকরী পাক এবং চাকরীতে এমন উন্নতি করুক এই দোয়ায়ই দুহাত তুলে করতে থাকেন।

তানবীরা তালুকদার
৩০.০৭.০৬